সংবাদ

তারিখ 22 JAN 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিম্নমুখী মান

দেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা 'ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন' সম্প্রতি তাদের ২০০৫ সালের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এই রিপোর্ট গত বছর জুন মাসের মধ্যে প্রকাশ করার কথা থাকলেও দেশের অধিকাংশ সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সময়মতো তথ্য ও পরিসংখ্যান সরবরাহ না করায় রিপোর্ট প্রণয়নে দেরি হয়েছে বলে জানিয়েছেন কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামান। কমিশনের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এ ধরনের আচরণ নতুন নয়। কমিশনের বিভিন্ন সুপারিশ বাস্তবায়নের প্রতিও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বাধ্যবাধকতা অনুভব করে না।

দেশের ২৪টি পাবলিক বা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কমিশন ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ৫০৯ কোটি টাকা সরকারি অর্থ দিয়েছে। সে বছর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাজেট ঘাটতি ছিল ৯ কোটি টাকা। কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের টাকার শতকরা ৮৬ ভাগ ব্যয় করে বেতন-ভাতা, পেনশন, বিদ্যুৎ ও পরিবহন খাতে! মাত্র ১৪ শতাংশ ব্যয় করা হয় শিক্ষার জন্য। ফলে শিক্ষার মান ধরে রাখা বা উন্নয়ন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। প্রতি বছরই এ ধরনের মন্তব্য কমিশনের পক্ষ থেকে করা হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিস্থিতি উন্নয়নে আগ্রহ প্রকাশ করে না। তাই বছরের পর বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার সার্বিক মান নিচে নেমে যাচ্ছে।

প্রায় প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ই নিয়মের খেলাপ করে নতুন বিভাগ খুলছে, অপ্রয়োজনীয় ও অযোগ্য শিক্ষক ও কর্মচারীদের নিয়োগ দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, এদের পদোন্নতি ও নানা ধরনের সুযোগ সুবিধাও দিচ্ছে। এসব বন্ধ করার জন্য কমিশন সরকারের প্রতি স্বায়ত্তশাসনের অপব্যবহার কমানোর আহ্বান জানিয়েছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিপুল পরিমাণ অর্থ পরিবহন, বিদ্যুৎ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত স্কুল ও কলেজগুলোর জন্য ব্যয় করছে। কমিশনের পক্ষ থেকে সরকারের প্রতি এ ধরনের অপব্যবহারে লাগাম টেনে ধরার আহ্বান জানানো হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে কমিশনের এ ধরনের সুপারিশের প্রতি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্তশাসনের দোহাই দিয়ে ভ্রূক্ষেপ করে না। তাদের এসব অনাচার নিয়ে পত্রপত্রিকায় লেখালেখি বা বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়েও কোন লাভ হয় না। এমনকি আদালতের নিষেধাজ্ঞার প্রতিও তারা ভ্রূক্ষেপ করে না। বিভিন্ন ধরনের অনাচার ও অর্থের অপব্যবহারের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়াও কঠিন হয়ে পড়ে। কেননা এসব করা হয় প্রধানত রাজনৈতিক বিবেচনায়। নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারে না। সাধারণত দেখা যায়, কমিশনকে উপেক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা ক্ষমতাসীন সরকারের সঙ্গে দেন-দরবার করেন। এসব বন্ধ না হলে শিক্ষা ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা রক্ষা ও মান উন্নয়ন কঠিন হয়ে পড়বে।

কমিশন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আয় বাড়ানোর জন্য প্রতি বছরই সুপারিশ করে থাকে। কমিশন এ কাজে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা, স্থানীয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা আদায় করার জন্য উদ্যোগ নিতে বলেছে। অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমানের ডিগ্রি প্রদানের জন্য একটি 'এক্রিডিটেশন কাউন্সিল' গঠন করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির মূল্যায়ন করার সুপারিশ করা হয়েছে। তেমনি প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আলাদা ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা না করে জাতীয় পর্যায়ে একক ভর্তি পরীক্ষার সুপারিশও করা হয়েছে। বহু দেশে এ প্রথা প্রচলিত আছে এবং এতে ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত মেধা যাচাইয়ে সুবিধা হচ্ছে। এ সুপারিশটিও কমিশন বেশ কয়েক বছর ধরেই দিয়ে আসছে। এতে ছাত্রছাত্রীদের হয়রানিও কমবে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের ভর্তি-বাণিজ্যের মুখে পড়ে আছে দেশের প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। এসব ব্যাপারে পদক্ষেপ সরকারকেই নিতে হবে।

পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ব্যাপারে কমিশনের অনুমতি নেয়ার কথা থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কমিশনকে উপেক্ষা করেই চলে। নতুন বিভাগ খোলা, পদোন্নতি ও নিয়োগের ব্যাপারে কমিশনের বেঁধে দেয়া নিয়মনীতির ব্যাপারে বিষয়টি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এসব বিবেচনা করে কমিশনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করে কমিশনকে আরও ক্ষমতা দেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে কমিশনের রিপোর্টে। বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শৃঙ্খলার যে ধরনের অভাব দেখা যাচ্ছে, তাতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সুপারিশগুলো বিবেচনা করাটা জরুরি হয়ে পড়েছে।